আন্তর্জাতিক বন দিবস ২০২৫
‘বন বনানী সংরক্ষণ, খাদ্যের জন্য প্রয়োজন’
দীপংকর বর

পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা করে এ ধরণীকে বাসযোগ্য রাখতে বনের গুরুত্ব অপরিসীম। বায়ুর গুণগতমান রক্ষা, জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে সৃষ্ট প্রাকৃতিক পরিবেশের বিরূপ প্রভাব রোধ, ভূমিক্ষয় ও মরুময়তা রোধ, কার্বন সংরক্ষণ এবং কার্বন নিঃসরণ রোধসহ প্রাণীকুলের বেঁচে থাকার মৌলিক চাহিদা পূরণে বন অনাদিকাল থেকে অনন্য ভূমিকা পালন করে আসছে। তাছাড়া, বনভিত্তিক জীবিকা বিশ্বব্যাপী কোটি কোটি মানুষের জীবনের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। কিন্তু বন উজাড় ও অপ্রতুল সংরক্ষণ কার্যক্রমের ফলে অনেক দেশেই বনজ সম্পদ হুমকির মুখে পড়ছে, যা খাদ্য নিরাপত্তাসহ সামগ্রিক পরিবেশের ওপর বিরূপ প্রভাব ফেলছে।

সভ্যতার ক্রমবিকাশের ফলে অপরিকল্পিত নগরায়ণ, শিল্পায়ন, বিভিন্ন ধরনের অবকাঠামোগত উন্নয়ন প্রভৃতির কারণে প্রতিনিয়তই বনভূমির পরিমাণ কমছে। বিকাশমান কৃষি ও আবাসনের জন্য ভূমি ব্যবহার পরিবর্তনের কারণে সংকুচিত হচ্ছে বনাঞ্চল। শুধু তাই নয়, নদী, খাল, জলাভূমি, জলাশয় ইত্যাদি জবরদখল ও ভরাটের কারণে প্রতিবেশের যে বিপর্যয়ের ঘটছে তা নিয়ন্ত্রণে আনা প্রয়োজন। তাই প্রতিবেশ, বন ও বন্যপ্রাণী রক্ষায় বন আইন, বন্যপ্রাণী (সংরক্ষণ ও নিরাপত্তা) আইনসহ এ সংক্রান্ত সকল আইন ও বিধিমালার সঠিক প্রয়োগ ও যথাযথ অনুসরণ নিশ্চিত করতে হবে।

বন সংরক্ষণ, পুনরুদ্ধার এবং টেকসই বন ব্যবস্থাপনার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদ ২০১২ সালে ২১ মার্চকে আন্তর্জাতিক বন দিবস হিসেবে ঘোষণা করে। বনজসম্পদের গুরুত্ব তুলে ধরতে এবং নীতিনির্ধারক, গবেষক ও সাধারণ মানুষকে বনায়নের গুরুত্ব সম্পর্কে উদ্বুদ্ধ করতে ২০১৩ সাল হতে প্রতিবছর বিশ্বের অন্যান্য দেশের মতো বাংলাদেশেও নির্দিষ্ট একটি প্রতিপাদ্যকে কেন্দ্র করে এ দিবস পালন করা হয়। এবারেও বন অধিদপ্তরে আন্তর্জাতিক বন দিবস উদযাপন করা হবে ।

২০২৫ সালের আন্তর্জাতিক বন দিবসের প্রতিপাদ্য ‘বন বনানী সংরক্ষণ, খাদ্যের জন্য প্রয়োজন’। এই প্রতিপাদ্য বর্তমান বৈশ্বিক বাস্তবতায় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও প্রাসঙ্গিক। বন আমাদের খাদ্য উৎপাদন ও পুষ্টি নিরাপত্তার সঙ্গে সরাসরি সম্পর্কিত। বিশ্বের বহু জনগোষ্ঠীর খাদ্য তালিকায় বন থেকে প্রাপ্ত ফলমূল, বাদাম, মধু, ভেষজ উদ্ভিদ, মাশরুম ও শাকসবজি গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করে আছে। সুতরাং, বন কেবল তাদের পুষ্টির উৎস নয়, বরং জীবনধারা ও সংস্কৃতির অবিচ্ছেদ্য অংশ। এছাড়া, অনেক ঔষধি উদ্ভিদ পুষ্টি ও ভেষজ চিকিৎসার জন্যও ব্যবহৃত হয়। বন থেকে পাওয়া সকল খাদ্য উপাদান মানুষকে পুষ্টি জোগানোর পাশাপাশি স্থানীয় জীববৈচিত্র্য টিকিয়ে রাখতেও ভূমিকা রাখে। বন উজাড় হলে খাদ্য উৎপাদনও হুমকির মুখে পড়ে।

সঠিকভাবে বন সংরক্ষণ করলে তা দীর্ঘমেয়াদে খাদ্য উৎপাদনশীলতা বজায় রাখতে এবং জীববৈচিত্র্য রক্ষা করতে সহায়তা করে। বন থেকে সংগৃহীত মশলা, তেল, রজন এবং ঔষধি গাছ খাদ্য ও ফার্মাসিউটিক্যাল শিল্পে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়। বনজ পণ্য রপ্তানি করে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করা সম্ভব, যা অর্থনীতিতে ইতিবাচক ভূমিকা রাখে। তাই বনজসম্পদের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করা হলে খাদ্যশিল্পের টেকসই উন্নয়ন সম্ভব হবে। খাদ্য উৎপাদন ও সরবরাহ টেকসই করতে হলে বন সংরক্ষণ ও পুনঃবনায়নের প্রতি সর্বোচ্চ গুরুত্ব দেওয়া উচিত।

বাংলাদেশে বনভূমির পরিমাণ মোট আয়তনের ১৫.৫৮ ভাগ এবং এবং বৃক্ষাচ্ছাদিত ভূমির পরিমাণ ২২.৩৭ শতাংশ যা প্রয়োজনের তুলনায় কম। দেশের প্রধান বনাঞ্চলগুলোর মধ্যে সুন্দরবন, পার্বত্য চট্টগ্রামের বন, মধুপুর গড় ও শালবন উল্লেখযোগ্য। বনভূমির উপর ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার চাপ, নগরায়ণ, শিল্পায়ন, কৃষি সম্প্রসারণ, অনিয়ন্ত্রিত বন নিধন ও জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে বনসম্পদ হ্রাস পাচ্ছে। বিশেষ করে, অবৈধ কাঠ কাটার প্রবণতা, চারাগাছের অপর্যাপ্ত রোপণ, বনাঞ্চলের ওপর অনুপ্রবেশ এবং বন্যপ্রাণীর আবাসস্থল ধ্বংসের ফলে জীববৈচিত্র্যও মারাত্মক হুমকির মুখে পড়েছে। এসব চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় সরকার নানাবিধ উদ্যোগ গ্রহণ করেছে।

পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয় দেশের বনজ সম্পদ সংরক্ষণ ও সম্প্রসারণের জন্য বিভিন্ন নীতি ও প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে। সামাজিক বনায়ন কর্মসূচি স্থানীয় জনগণকে সম্পৃক্ত করে বন সৃজনের মাধ্যমে পরিবেশ সংরক্ষণের পাশাপাশি দারিদ্র্য নিরসনেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। বন সংরক্ষণ আইন দেশের বনাঞ্চল ও বন্যপ্রাণী সংরক্ষণে আইনি কাঠামো প্রদান করছে। এ ছাড়া, টেকসই বন ব্যবস্থাপনার অংশ হিসেবে গ্রিন ইকোনমি ধারণা বাস্তবায়ন করা হচ্ছে, যেখানে বনজসম্পদ ব্যবহারে পরিবেশগত ভারসাম্য রক্ষা করা হয়।

বন অধিদপ্তরের আওতায় বন ও বৃক্ষাচ্ছাদন বৃদ্ধি, বন পুনরুদ্ধার কার্যক্রম, বন অবক্ষয় রোধ, জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ,

জলবায়ু পরিবর্তনজনিত নেতিবাচক প্রভাবসহ অন্যান্য সংকট মোকাবিলা, উপকূলীয় সবুজ বেষ্টনী সৃজন এবং বন নির্ভর জনগোষ্ঠীর বনের ওপর নির্ভরশীলতা কমানোর জন্য বিকল্প কর্মসংস্থান সৃষ্টির জন্য বিভিন্ন বনভূমিতে ১৪টি উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। চলতি ২০২৪-২৫ অর্থবছরে ৩ হাজার ৫৩০ হেঃ ব্লক বাগান, ৮৬৬ কি.মি. স্ট্রিপ বাগান, ৪৬০ হেক্টর ম্যানগ্রোভ বাগান সৃজন এবং বিক্রয় বিতরণের জন্য ১৯ দশমিক ৮০ লক্ষ চারা উত্তোলনের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। এছাড়াও, জবরদখলকৃত মোট বনভূমির উদ্ধারে বিশেষ অভিযান পরিচালনা করা হচ্ছে। ফেব্রুয়ারি/২০২৫ পর্যন্ত ৩৩ হাজার ৮২ একর বনভূমি উদ্ধার করা হয়েছে।

বন, বন্যপ্রাণী ও জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনার জন্য জাতীয় বননীতি ২০২৪ অনুমোদন প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। এছাড়া বন ও বৃক্ষ সংরক্ষণ আইন, ২০২৫ এবং গ্রামীণ বন বিধিমালা, ২০২৫ প্রণয়নের কার্যক্রম চলমান রয়েছে। বিরল ও বিপন্ন প্রজাতির উদ্ভিদ সংরক্ষণ ও টেকসই ব্যবস্থাপনার লক্ষ্যে বাংলাদেশ ন্যাশনাল হার্বেরিয়াম এবং আইইউসিএনএর সহায়তায় ১ হাজার টি উদ্ভিদ মূল্যায়নপূর্বক রেড লিস্ট প্রকাশ করা হয়েছে।

বন অধিদপ্তরের মাঠ পর্যায়ের সকল অফিসসমূহে নার্সারিতে ইউক্যালিপটাসের পাশাপাশি জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ বিবেচনায় আকাশমনি প্রজাতির চারা উত্তোলন ও রোপণ বন্ধ রাখার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। বৃক্ষ সংরক্ষণ ও এর বৃদ্ধি ত্বরান্বিত করার জন্য বৃক্ষ হতে পেরেক উত্তোলন কার্যক্রম চলমান রয়েছে। বন সংরক্ষণ ও বন খাত থেকে কার্বন নি:সরণ কমানোর লক্ষ্যে ১ হাজার ৩০৩ একর জবরদখলকৃত বনভূমি উদ্ধারপূর্বক বনায়ন করা হয়েছে।

পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টার বিশেষ উদ্যোগে বিভিন্ন সরকারি কাজে বরাদ্দকৃত বনের জমি ফিরিয়ে আনা হয়েছে। এর অংশ হিসেবে বর্ণিত কার্যক্রমসমূহ বন, বন্যপ্রাণী ও জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। কক্সবাজারের মহেশখালী উপজেলার সোনাদিয়ার পরিবেশ ও জীববৈচিত্র্য রক্ষায় ইকো-ট্যুরিজম পার্ক স্থাপনের জন্য বাংলাদেশ অর্থনৈতিক অঞ্চল কর্তৃপক্ষের (বেজা) অনুকূলে বরাদ্দকৃত ৯ হাজার ৪৬৭ একর জমি বন বিভাগের অনুকূলে হস্তান্তরের উদ্যোগ নিয়েছে সরকার। জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের অনুকূলে প্রশাসন একাডেমি স্থাপনের জন্য বন্দোবস্তকৃত কক্সবাজার জেলার সদর উপজেলায় ৭০০ (সাতশত) একর এবং মাল্টিডিসিপ্লিন একাডেমির নামে ১৫৬ একর বনভূমির বন্দোবস্ত বাতিল করা হয়। বাংলাদেশ ফুটবল ফেডারেশন (বাফুফে) এর 'টেকনিক্যাল সেন্টার' নির্মাণের জন্য কক্সবাজার জেলার রামু উপজেলায় বরাদ্দকৃত ২০ একর সংরক্ষিত বনভূমি অবমুক্তকরণ (ডি-রিজার্ভ) বিষয়ক জারীকৃত প্রজ্ঞাপন বাতিল করা হয়। এছাড়া একই ধরনের আরও কয়েকটি বরাদ্দ বাতিলের কার্যক্রম মন্ত্রণালয়ে প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

বন, বন্যপ্রাণী ও জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ ও সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার লক্ষ্যে স্বল্প ও দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়েছে এবং সে অনুযায়ী বিভিন্ন কার্যক্রম পরিচালনা করা হচ্ছে- রক্ষিত এলাকার মাস্টারপ্ল্যান ও ম্যানেজমেন্ট প্ল্যান প্রণয়ন; দেশীয় ও বিলুপ্তপ্রায় উদ্ভিদ প্রজাতির জীনপুল সংরক্ষণ ও সম্প্রসারণ; সরকারি জবরদখলকৃত বনভূমি উদ্ধারপূর্বক বনায়ন কার্যক্রম পরিচালনা; বাংলাদেশের বন এবং বন্যপ্রাণী ও তাদের আবাসস্থল সংরক্ষণে জনসাধারণকে সচেতন করার জন্য বিভিন্ন সভা, সেমিনার, ওয়ার্কশপ, কনফারেন্স, দিবস উদযাপন, ওয়াইল্ডলাইফ অলিম্পিয়াড পোস্টার, বিলবোর্ড, লিফলেট, বুকলেট বিতরণসহ বিভিন্ন কার্যক্রম পরিচালনা।

বাংলাদেশ একটি ঘনবসতিপূর্ণ দেশ। আমাদের যেটুকু বনাঞ্চল আছে সেটার সংরক্ষণ নিশ্চিত করার পাশাপাশি বনের স্বাস্থ্য ও বৈচিত্র্য উন্নত করতে হবে। বন অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন সামাজিক বনায়ন কার্যক্রমের মাধ্যমে পতিত ও প্রান্তিক সরকারি ও ব্যক্তিমালিকানাধীন ভূমি বনায়নের আওতায় এসেছে। সামাজিক বনায়ন কার্যক্রম গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর আর্থসামাজিক অবস্থার উন্নয়ন, কর্মসংস্থান সৃষ্টি এবং প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর ক্ষমতায়ন ও সরকারি সম্পদ ব্যবস্থাপনায় সিদ্ধান্ত গ্রহণে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখছে। ভবিষ্যত প্রজন্মের জন্য নির্মল পরিবেশ সৃষ্টিতে সামাজিক বনায়ন অগ্রণী ভূমিকা পালন করছে। বনায়ন কার্যক্রমে স্থানীয় জনগোষ্ঠীর অংশগ্রহণের জন্য সবুজ অর্থনীতি যাত্রা ত্বরান্বিত হচ্ছে।

বন সংরক্ষণে স্থানীয় জনগণের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বন নির্ভরশীল জনগোষ্ঠী যেমন বিশেষ নৃগোষ্ঠী, কৃষক ও স্থানীয় বাসিন্দারা বনসম্পদের প্রতিদিনের ব্যবহারকারী। তাই বন সংরক্ষণে তাদের সম্পৃক্ততা বৃদ্ধি করতে হবে। সামাজিক বনায়ন প্রকল্পের মাধ্যমে সরকার স্থানীয় জনগণকে বন রক্ষণাবেক্ষণ ও ব্যবস্থাপনায় অন্তর্ভুক্ত করছে, যেখানে তারা বন সৃজনের পাশাপাশি অর্থনৈতিকভাবে লাভবান হচ্ছে। এ ছাড়া, বিভিন্ন বেসরকারি সংস্থা ও পরিবেশবাদী সংগঠন স্থানীয় জনগণের মধ্যে বন সংরক্ষণ ও টেকসই ব্যবহার সম্পর্কে সচেতনতা সৃষ্টি করছে। বাংলাদেশে বন সংরক্ষণ ও সম্প্রসারণের জন্য সরকারের প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে। তবে, জনগণের সক্রিয় অংশগ্রহণ ছাড়া এই প্রচেষ্টা সফল হবে না। স্থানীয় জনগণ, কৃষক, বননির্ভর সম্প্রদায় এবং নীতিনির্ধারকদের মধ্যে বনের সঠিক ব্যবহারের বিষয়ে সচেতনতা বাড়ানো দরকার। গণমাধ্যম, সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম, স্কুল-কলেজের শিক্ষা কার্যক্রম এবং সরকারি-বেসরকারি সংস্থার প্রচারণার মাধ্যমে মানুষকে বোঝাতে হবে যে বন সংরক্ষণ শুধু জীববৈচিত্র্যের জন্য নয়, বরং টেকসই খাদ্য উৎপাদন ও ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্যও অপরিহার্য।

টেকসই বন ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করতে হলে পরিকল্পিত নীতি প্রণয়ন এবং সেগুলোর বাস্তবায়ন জরুরি। বাংলাদেশে সামাজিক বনায়ন, বন সংরক্ষণ আইন ও বনভিত্তিক জীবিকা উন্নয়নের মতো বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে, তবে এগুলোকে আরও কার্যকর করতে হবে। বন উজাড় রোধে কঠোর মনিটরিং, অবৈধ কাঠ ব্যবসা নিয়ন্ত্রণ এবং বনভূমি পুনঃবনায়নের উপর

বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া প্রয়োজন। একইসঙ্গে স্থানীয় জনগোষ্ঠীকে বন সংরক্ষণে সম্পৃক্ত করা গেলে বন ও খাদ্যের টেকসই সম্পর্ক রক্ষা করা সম্ভব হবে। নীতিনির্ধারণের ক্ষেত্রে কৃষি ও বন বিভাগের মধ্যে সমন্বয় বৃদ্ধি, বনজ খাদ্যের চাষাবাদকে উৎসাহিত করা এবং বন ব্যবস্থাপনায় আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহার বৃদ্ধি করতে হবে।

বন সংরক্ষণ ও খাদ্য নিরাপত্তার ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক সহযোগিতা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবিলা করতে উন্নত দেশগুলোর প্রযুক্তিগত ও আর্থিক সহায়তা দরকার। বন সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনায় উন্নত দেশগুলোর অভিজ্ঞতা কাজে লাগিয়ে বাংলাদেশও টেকসই উন্নয়নের পথে এগিয়ে যেতে পারে। জাতিসংঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থা, জলবায়ু পরিবর্তন সম্পর্কিত আন্তঃসরকার প্যানেল এবং বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থার গবেষণাকে কাজে লাগিয়ে দেশীয় নীতিমালা প্রণয়ন করলে বন সংরক্ষণ আরও কার্যকর হবে। গবেষণা ও উদ্ভাবনের মাধ্যমে বনজ খাদ্য উৎপাদন, রপ্তানি এবং স্থানীয় জনগোষ্ঠীর জীবিকা উন্নয়নের পথ সুগম করা সম্ভব হবে। বন সংরক্ষণ ও খাদ্য নিরাপত্তার মধ্যে ভারসাম্য বজায় রাখতে জনসচেতনতা, কার্যকর নীতি ও আন্তর্জাতিক সহযোগিতার সমন্বিত প্রয়াস প্রয়োজন। এ লক্ষ্যে সরকার, গবেষক, স্থানীয় জনগোষ্ঠী ও আন্তর্জাতিক সংগঠনগুলোর একসঙ্গে কাজ করা জরুরি।

বিশ্বব্যাপী ক্রমবর্ধমান খাদ্য নিরাপত্তার সংকট ও পরিবেশগত পরিবর্তনের মুখে বন সংরক্ষণ ও খাদ্য ব্যবস্থাপনার মধ্যে একটি ভারসাম্যপূর্ণ নীতির প্রয়োজনীয়তা আজ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে। তাই উন্নয়ন নীতিমালায় এমন দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করতে হবে, যেখানে বন সংরক্ষণ ও খাদ্য নিরাপত্তা পরস্পরের সম্পূরক হিসেবে বিবেচিত হবে। বাংলাদেশে সামাজিক বনায়ন, বনজসম্পদ ব্যবস্থাপনা এবং টেকসই কৃষি চর্চার মাধ্যমে এই ভারসাম্য রক্ষার উদ্যোগ ইতোমধ্যে নেওয়া হয়েছে, তবে তা আরও কার্যকর করতে প্রয়োজন দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন।

এদেশকে বর্তমান জনগোষ্টী ও ভবিষ্যত প্রজন্মের জন্য বাসযোগ্য টেকসই পরিবেশ উন্নয়নকল্পে বিজ্ঞানভিত্তিক ও লাগসই প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে বন সংরক্ষণ, উন্নয়ন, বনজদ্রব্যের টেকসই উৎপাদন এবং এর সুচিন্তিত ও টেকসই ব্যবহার একান্ত প্রয়োজন। এ লক্ষ্য অর্জনে সরকারের পাশাপাশি বেসরকারি সংস্থা, স্থানীয় জনগোষ্ঠী, কৃষক, গবেষক এবং সাধারণ মানুষের সম্মিলিত প্রচেষ্টা অত্যন্ত জরুরি। বন উজাড় বন্ধে জনসচেতনতা বৃদ্ধি, পরিবেশবান্ধব কৃষি ব্যবস্থা গড়ে তোলা, বনের ওপর নির্ভরশীল জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন এবং গবেষণা ও প্রযুক্তির সহায়তায় বনসম্পদের সঠিক ব্যবহার নিশ্চিত করা গেলে টেকসই ভবিষ্যৎ নিশ্চিত করা সম্ভব হবে। আন্তর্জাতিক বন দিবস ২০২৫ আমাদের এই বাস্তবতা উপলব্ধি করার সুযোগ এনে দিয়েছে, যেখানে সবাই মিলে একটি সুস্থ, সবুজ ও খাদ্যনিরাপদ পৃথিবী গড়ার জন্য অবদান রাখতে পারে। এখন সময় এসেছে ব্যক্তিগত, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে একসঙ্গে কাজ করার, যাতে বন আমাদের খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করার পাশাপাশি পরিবেশ রক্ষার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে।

#

লেখকঃ উপপ্রধান তথ্য অফিসার, পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়

পিআইডি ফিচার